আকস্মিক দুর্যোগ বজ্রপাত থেকে বাঁচার উপায়

মো. বেলায়েত হোসেন

বোরো ধানে পাক ধরেছে। ঘরে তুলতে সমূহ আয়োজন চারদিকে। ব্যস্ত হাওড়ের প্রতিটি গ্রাম। এবছরের ১৮ এপ্রিল শনিবার, ধান কাটায় মগ্ন কৃষক। আকাশের কালো মেঘের দিকে তাকানোর সময় নেই। ঠিক সেসময় শুধুমাত্র সুনামগঞ্জের তিন উপজেলাতেই বজ্রপাতের সাথে সাথে পাঁচ জনের অকাল মৃত্যু। ধমকে গেছে পাঁচটি পরিবারের জীবিকা নির্বাহের উপার্জনক্ষম পথ। শুধু মানুষ নয়, সেদিন একই কারণে দিরাই উপজেলার দুটি গ্রামে তেরোটি গরু মারা যায়। হাওরে খোলা-মেলা হওয়ায় সঙ্গত কারণে বজ্রপাতে মৃত্যুর হার অত্যধিক। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলও এমন আকস্মিক, অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু থেকে রেহাই পাচ্ছে না। গত ২৯ মার্চ খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের সাইংগুলি পাড়ায় গহেন কুমার ত্রিপুরা বিকেলে রান্না ঘরে কাজ করছিলেন। এমন সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এ মৃত্যু এখানে নতুন নয়। প্রতিবছরই ঘটে। অথচ পাহাড় মানেই বনভূমি। তাহলে এখানে কেন বজ্রপাতে মৃত্যু ঘটবেন? নিশ্চয় আক্রান্ত ব্যক্তির হাতে বিদ্যুৎ পরিবাহী কোন বস্তু ছিলো। তাহলে বুঝা যাচ্ছে বজ্রপাতে মৃত্যুর পিছনে অনেকগুলো বিস্তৃত কারণ রয়েছে।

সাধারণত এপ্রিল থেকে জুনে বজ্রপাত বেশি হয়ে থাকে। তবে আগস্ট -অক্টোবরেও হয়ে থাকে। এ ধারণার ব্যতিক্রমে কালবৈশাখী আসার পূর্বেই এবছর ইংরেজি মার্চ এবং বাংলা চৈত্র মাসের প্রথমদিক থেকেই প্রবল ঝড়- বৃষ্টির সাথে বজ্রপাতে কয়েকটি জেলায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। আবার সাধারণত খোলা মাঠে বজ্রপাতে অধিকাংশ মৃত্যু হয়। বজ্রপাতের কালো থাবা দিনে দিনে বেড়ে চলছে সমতল থেকে পাহাড়ে সমানতালে। ব্যতিক্রমী সময় এবং স্থানে বজ্রপাতে মৃত্যুর বার্তাগুলো ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এসব ঘটনা আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের ধারাবাহিক বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে আসে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দিনে দিনে বায়ুমণ্ডল উষ্ণ হচ্ছে। 'রোল অব পলিউট্যান্টস অন দ্য বাইমোডাল লাইটনিং ডিস্ট্রিবিউশন ইন বাংলাদশে' শীর্ষক এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয় যে, এপ্রিল থেকে মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের দিক থেকে প্রবাহিত শক্তিশালী পশ্চিমা বাতাস বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে ধূলিকণা ও সালফেট নিয়ে আসে। বাংলাদেশেও বিভিন্নভাবে সালফার বায়ুমণ্ডলে গিয়ে বায়ু দূষণসহ বজ্রপাত সৃষ্টির কারণে যুক্ত হচ্ছে। এই উপাদানগুলো মেঘের গঠনে প্রভাব ফেলে এবং বজ্রপাতের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। এসব কারণে বায়ুমন্ডলের নিচের তুলনায় উপরের অংশে তাপমাত্রা কম থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, নিচের দিক থেকে উপরের দিকে মেঘ প্রবাহিত হয়। এ ধরনের মেঘকে থান্ডার ক্লাউড বা বজ্র মেঘ বলে। অন্যান্য মেঘের মতো এ মেঘেও ছোট ছোট জলের কণা থাকে। আর উপরে উঠতে উঠতে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে জলের পরিমাণ যখন ৫ মি. মি. এর বেশি হয়, তখন জলের অণুগুলো আর পারস্পরিক বন্ধন ধরে রাখতে পারে না। তখন এরা আলাদা হয়ে যায়। ফলে সেখানে বৈদ্যুতিক আধানের সৃষ্টি হয়। আর এ আধানের মান নিচের অংশের চেয়ে বেশি হয়। এরকম বিভব পার্থক্যের কারণেই ওপর হতে নিচের দিকে বৈদ্যুতিক আধানের নির্গমনের ঘটনা ঘটে। এ সময় আমরা আলোর ঝলকানি বা বজ্রপাত দেখতে পাই। অন্যদিকে শীতকালে বায়ুমণ্ডলের নিম্নাঞ্চল শীতল হওয়ায় এ ধরনের ঘটনা কমতে থাকে। এতে বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকে না।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২১ সালের রিপোর্ট অনুসারে, ২০১৫ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে বজ্রপাতে ১০ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬ শত ৫৯ পরিবার আক্রান্ত হয়। যা প্রাকৃতিক দুর্যোগে মোট আক্রান্তের ১৪ দশমিক ২২ শতাংশ। জাতিসংঘের মতে, বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ৩৫০ জন মানুষ বজ্রপাতে মারা যান। যুক্তরাষ্ট্রে এ সংখ্যা মাত্র ২০ জন। বাংলাদেশে বছরে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪০ থেকে ৬০টি বজ্রপাতরে ঘটনা ঘটে, যা এই অঞ্চলরে জন্য অশনি সংকেত। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সরকার বজ্রপাতকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে। হাওড় এলাকা যেমন- বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলা যেখানে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কোন গাছপালা নেই, সেখানে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয়ে থাকে। ২০২০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বজ্রপাতে সুনামগঞ্জে নিহত হয় ৪৬ জন। এ এলাকায় বজ্রপাত একটি আতঙ্কের নাম। মৃত্যু আতঙ্ক তাড়া করে ফিরছে কৃষকদের। এ মৌসুমে ধান কাটতে শ্রমিক সংকট মেটাতে তিন শুল্ক স্টেশন বন্ধ করে উদ্বুদ্ধ করতে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক মাইকিংও করা হচ্ছে।

বজ্রপাতের ভয়াবহতার পাশাপাশি এর কিছু ভালো দিকও প্রমাণিত। কৃষি জমির উর্বরতা আর মাছের বংশ বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। সাইবেরিয়ান সায়েন্টেফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব জিওলজি কর্মকর্তা ভি বেগাটভের মতে, 'যদি পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে বজ্রপাত না হতো, তবে বিশ্বের সব কারখানাকে নাইট্রোজেন সার কারখানায় পরিণত করতে হতো।' যেহেতু নিহতদের অধিকাংশ কৃষক, তাই এখন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই উপকারী প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে জীবনের সুরক্ষা করা। বজ্রপাত নিয়ে আমাদের দেশে কিছু কার্যক্রম দেখা গেলেও তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট নয়। যেসব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিয়ে গবেষণা, প্রতিবেদন, সম্ভাব্য কার্যক্রম এবং সচেতনতা নিয়ে কাজ করছে; তারা বজ্রপাতের বিষয়টি নিয়ে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম এখনো শুরু করেনি। এর ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে এখন তা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। কৃষিজমির আইলে আগে যেভাবে

বাবলা, খেজুরগাছ, তালগাছের সমারোহ ছিলো; সে পরিবেশ আবার আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। গাছ লাগানোর পাশাপাশি গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকেও তালগাছ লাগানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিলো।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্য ১৩ নম্বরে জলবায়ু বিষয়ক পদক্ষেপ এর ১৩.১ নম্বর সূচকে সকল দেশে জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতকি দুর্য়োগ মোকাবেলায় অভিঘাত সহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধি করার কথা কলা হয়েছে। এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে ২০১৬ সাল থেকে। শেষ হবে আর মাত্র চার বছর অর্থাৎ ২০৩০ সালে। অথচ দুর্য়োগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তররে তথ্য মতে, ২০১১ থেকে ২০২৫ সালের ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত ১৫ বছরে বাংলাদেশে বজ্রপাতে তিন হাজার ৮৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২০২৪ বজ্রপাতে মৃতের সংখ্যা ২৭১ জন। এ ধরনের প্রতিবেদন লক্ষ্য অর্জনের বিপরীতে নিয়মিত হতাশার বার্তা দিচ্ছে।

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত ভেনিজুয়েলায় হয়ে থাকে। আফ্রিকা অঞ্চলেও অনেক বেশি বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। বজ্রপাত থেকে সুরক্ষা পেতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন International Conference on Lightning Protection এর ৩৭তম সম্মেলন ২০২৪ সালে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হয়। এর ৩৮তম সম্মেলন আগামী ৩১ মে- ৫জুন ২০২৬ সাপ্পোরো, জাপানে অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়টি হচ্ছে আক্রান্ত এবং মোকাবেলায় সফল দেশসমূহের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে আমরা কতটুকু এগিয়ে যেতে পারি, তার উপর নির্ভর করছে সফলতা। এটিই আলোচ্য বিষয় হতে পারে।

আলোর বেগ শব্দের বেগের চেয়ে বেশি হওয়ায় বজ্রপাতের শব্দ শোনার আগেই আমরা আলোক ঝলকানি দেখতে পাই। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফসের ইয়াসির আরাফাত বজ্রপাতে মৃত্যুর হার কমানোর জন্য ৩০-৩০ নিয়মের দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এটি হচ্ছে- প্রথম বজ্রপাতের ঝলকানি দেখা বা শব্দ শোনা মাত্র ঘড়ি, মোবাইল, বা স্টপওয়াচ অথবা হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে ৩০ পর্যন্ত গণনা করে একটা পরিমাপ নিতে হবে। ঝলকানি দেখা ও শব্দ শোনার মাঝে যদি ৩০ সেকেন্ড বা তার চেয়ে কম সময় থাকে তাহলে জীবন বাঁচাতে নিরাপদ আশ্রয়ে যেমন-পানিরোধী ছাদযুক্ত, শুকনো ফ্লোর বিশিষ্ট এবং বজ্রনিরোধক ব্যবস্থা যুক্ত স্থাপনায় অবস্থান করা। যতক্ষণ বজ্রপাত চলবে ততক্ষণ নিরাপদ আশ্রয়ের অভ্যন্তরে থাকা আর বজ্রপাত থেমে গেলেও অতিরিক্ত আরও ৩০ মিনিট নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান করা। আর লক্ষ্য করতে হবে বজ্রপাত বন্ধ হয়েছে না-কি চলমান রয়েছে; বন্ধ না হলে নিরাপদ আশ্রয়ের অভ্যন্তরে থাকা।

বাংলাদেশে বজ্রপাতে মৃত্যুর অন্যতম কারণ হলো খোলা জায়গায় মানুষের উপস্থিতি। কৃষক, জেলে বা মাঠে কাজ করা মানুষরা ঝড়ের সময়ও বাইরে থাকেন, ফলে ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া, অনেক এলাকায় নিরাপদ আশ্রয়ের অভাব এবং বজ্রপাত সম্পর্কে পর্যাপ্ত সচেতনতার ঘাটতিও বড়ো কারণ হিসেবে দেখা হয়। বজ্রপাতের সময় কী করা উচিৎ, তা নিয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা আছে।

সেই নির্দেশনা অনুযায়ী, বজ্রপাতের সময় সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো ঘরের ভেতর থাকা। খোলা মাঠ, জলাশয় বা উঁচু গাছের নিচে আশ্রয় নেওয়া বিপজ্জনক। অনেক ক্ষেত্রে বজ্রপাত কাছাকাছি আঘাত করলেও বৈদ্যুতিক প্রবাহ মাটির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যা আশপাশে থাকা মানুষকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই, অতি জরুরি প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলে রাবারের জুতা পরে যেতে হবে। বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা খোলামাঠে যদি থাকেন তাহলে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে নিচু হয়ে বসে পড়তে হবে। বজ্রপাতের আশংকা দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। ভবনের ছাদে বা উঁচু ভূমিতে যাওয়া উচিত হবে না।

খালি জায়গায় যদি উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, ধাতব পদার্থ বা মোবাইল টাওয়ার থাকে, তার কাছাকাছি থাকা যাবে না। বজ্রপাতের সময় ছাউনিবিহীন নৌকায় মাছ ধরতে না যাওয়াই উচিৎ হবে। সমুদ্রে বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। যদি কেউ গাড়ির ভেতরে থাকে, তবে গাড়ির ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ রাখা যাবে না। আর বজ্রপাতে আহত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, তাই দ্রুত তাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশ সমুদ্র তীরবর্তী দেশ হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে অন্যতম ভুক্তভোগী দেশ। আশার বিষয় হচ্ছে, আমাদের দেশ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে মোকাবেলায় বিশ্বে রোল মডেল। তাই সমন্বিতভাবে বর্তমান প্রযুক্তি এবং দক্ষতা অর্জনের নিমিত্ত সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বজ্রপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মোকাবেলা করা সম্ভব। বজ্রপাত অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে চেয়ে ব্যতিক্রম। এটির একটি ঘটার মাস- ব্যাপ্তি নির্ধারণ করা গেলেও দিন, ঘণ্টা, মিনিট নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। সে জন্য এটি থেকে বাঁচতে গবেষণার পাশাপাশি জনসচেতনতাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। বজ্রপাতে মৃত ব্যক্তির মধ্যে ৭০ শতাংশই কৃষক, জেলেসহ নিম্ন আয়ের মানুষ। কৃষকের সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষি অফিস। আর জেলের সাথে সংশ্লিষ্ট মৎস্য অফিস। এ দুই অফিসকে তাদের স্ব- স্ব ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজে লাগানো যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য অফিস সক্ষমতার ভিত্তিতে এ বিষয়ে সড়ক প্রচার, ভিডিওচিত্র প্রদর্শন এবং বৈঠকের মাধ্যমে তৃণমূলের জনগোষ্ঠীরে মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে আসছে। সময়ের

পরিক্রমায় বজ্রপাত বিষয়ে পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্তি ভবিষ্যত প্রজন্মকে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভের সুযোগকে বিস্তৃত করবে। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় আলোচনা- বিশেষ করে মসজিদে শুক্রবারের খোতবার সময় এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনাও তৃণমূলের অসচেতন ও অশিক্ষিত মানুষদের সচেতন করতে একান্ত সহায়ক হতে পারে। এছাড়া সরকারের মাঠ পর্যায়ের যেসব প্রতিষ্ঠান সরাসরি তৃণমূলের মানুষদের নিয়ে কাজ করে, তারা বিভিন্ন সভায় দু'এক মিনিটের জন্য এ দুর্যোগে বিষয়ে আলোকপাত সচেতনতা বৃদ্ধিতে অনেকদূর নিয়ে যাবে। বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান- এনজিও এবং সমাজ উন্নয়ন সংস্থাগুলো এর করণীয় সম্পর্কে বিশেষ বার্তা প্রচার বজ্রপাতের ভয়াবহতা এবং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

#

লেখক: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, খাগড়াছড়ি

পিআইডি ফিচার